প্রথম আলো

তারিখ 23 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

# বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় যে পরিবর্তন কাম্য

উচ্চশিক্ষা | এম এম শহীদুল হাসান

উপাচার্য, ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি

বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা চলছে। এখন অমীমাংসিত বিষয়গুলোর মধ্যে মুখ্য দুটি বিষয় হচ্ছে– ১. শিক্ষাদান ও গবেষণা কি শুধু ব্যক্তিবিশেষের ব্যাপার এবং ২. শিক্ষকদের কাজ কি কেবল ছাত্রদের বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এবং গবেষণায় দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য এবং সামাজিক দায়িত্বগুলো নিয়ে। শিল্পায়নের শুরুতে শিক্ষকদের গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে অনেক ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্যের ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষকদের গবেষণার বাণিজ্যিকরণের ধারা গ্রহণ করে এবং এ সময়ে প্রায়োগিক গবেষণার গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। আমেরিকায় সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ গড়ে ওঠে, যখন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে একটি নতুন প্রোগ্রাম চালু করে। পরে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইনফরমেশন টেকনোলজি বিষয়ে নতুন প্রোগ্রাম চালু হয়। অন্যদিকে জাপানের শিল্পপতিরা শুরুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজস্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পরে শিল্পপতিরা উপলব্ধি করেন, শিক্ষকরা এ ব্যাপারে বেশি উপযুক্ত এবং তাদের গবেষণার ফলাফল ইন্ডাস্ট্রির জন্য অধিকতর কাজে লাগবে। এ কারণে জাপানে বর্তমানে শিল্পপতিরা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। অন্যদিকে টেকনোলজিভিত্তিক শিল্পায়নে শুরু থেকে কোরিয়া ও তাইওয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে দার্শনিক উলহেম ভন হামবোল্ড প্রস্তাবিত মডেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় (বর্তমানে হামবোল্ড বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে ব্যক্তির যুক্তিবাদী, গবেষণার ক্ষমতা ও ছাত্রদের অধ্যয়নরত বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে সহায়তা করা আর সেটা হবে সমাজ, ধর্ম ও অর্থনৈতিক প্রভাবমুক্ত। সে সময়ে সমাজে শুধু উচ্চ সম্প্রদায়ের সন্তানরা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়ে তাদের অনেকেই সরকারি উচ্চপদে আসীন হতো। তাদের কেউ কেউ আবার গবেষণার কাজে নিজেদের নিবেদিত করত। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়োগিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে থাকে। গবেষণার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইন্ডাস্ট্রিজের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে ওঠে। শিল্পায়ন, টেকনোলজির ব্যবহারের বিস্তার ও সহজলভ্যতা, বিভিন্ন বিষয়ে লেখাপড়া করার সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার উন্নত পরিবেশ, গ্লোবালাইজেশন এবং চাকরি ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টির ফলে সাধারণ পরিবারের সন্তানরাও এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এখন ইউটিলিটারিয়ান বিষয়গুলোর ওপর প্রোগ্রাম চালু করেছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭১ সালে দেশটিতে মাত্র ছয়টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বর্তমানে ৪১টি পাবলিক ও ৯৮টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে। বর্তমানে ৩৬ লাখের অধিক শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য পড়াশোনা করছে; ২০০৭ সালে যেখানে মাত্র ১০ লাখ শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে– ১. উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী গ্র্যাজুয়েট তৈরি; ২. নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং ৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইউটিলিটারিয়ান বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে। একটি সহনশীল, সৃষ্টিশীল চিন্তার অধিকারী, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমিক এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষিত যুবক শ্রেণি গঠনে শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তন একদিনে হয়নি। সব শ্রেণির সন্তানদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া, অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্রমান্বয়ে উচ্চশিক্ষিতদের ভূমিকার প্রসার এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে টেকনোলজির ব্যবহার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পুরনো খোলস পাল্টাতে হয়েছে এবং হচ্ছে। উন্নত দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তন লক্ষণীয়। জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে কারিকুলাম প্রণয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হয় (পূর্বে যেখানে শিক্ষকরা সিলেবাস প্রণয়ন করে থাকতেন) এবং উদ্ভাবনী ও গভীরতর চিন্তাশক্তির অধিকারী গ্র্যাজুয়েট তৈরিতে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। সিঙ্গাপুরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালগুলোর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। একটি হতদরিদ্র ছোট (৭০০ বর্গকিলোমিটার) দেশটির অল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অসাধারণ অর্জন থেকে আমাদের শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে। ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। ৫২ বছর আগে সে দেশে মানুষের গড় আয় মার্কিন ৩২০ ডলারের নিচে ছিল আর বর্তমানে মানুষের গড় আয় মার্কিন ৬০ হাজার ডলারের ওপরে। শিল্প স্থাপনে বিদেশি উদ্যোক্তাদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে সিঙ্গাপুর অর্থনৈতিক উন্নতির যাত্রা শুরু করে এবং আজকে আলট্রা শিল্পায়ন দেশ হিসেবে পরিচয় লাভ করেছে। শুরুতেই সে দেশে শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। উন্নতির স্বার্থে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮০ সালের শুরুতে শিল্পায়নের জন্য দক্ষ, উচ্চশিক্ষিত মানবসম্পদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। শিক্ষা পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়, একপক্ষীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে বহুধারার শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। ১৯৯০ সালের শেষ দিকে সিঙ্গাপুর জ্ঞানভিত্তিক অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তখন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে। শিক্ষকদের প্রমোশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতার পরিবর্তে যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেওয়া শুরু হয়। পশ্চিমা দেশের প্রথিতযশা বিজ্ঞানী, প্রকৌশল, টেকনোলজি ও প্রশাসনিক বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকদের সরকার সিঙ্গাপুরের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণার জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। শিক্ষকরা পাঠদানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং জ্ঞান সঞ্চালকের পরিবর্তে ফ্যাসিলিটেটরের ভূমিকা নেয়। আজীবন জ্ঞান (lifelong learning) অর্জনের পটভূমি তৈরিতে শিক্ষকরা সহায়কের ভূমিকা নেন। শিক্ষকরা শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতির পরিবর্তে ছাত্রকেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতিতে পাঠদান শুরু করেন। ছাত্রকেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতিতে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়ই পঠিত বিষয়বস্তু নিয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। গ্রুপ ওয়ার্ককে উৎসাহিত করা হয়। কোর্স শিক্ষককে প্রতিটি ছাত্রের পড়াশোনার অগ্রগতি মনিটর করতে হয়। ক্লাসে ছাত্রদের একটি বড় অংশের অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলে তার কারণ অনুসন্ধান করে শিক্ষককেই সমাধান করতে হয়। যেসব ছাত্র শুধু ডিগ্রি পাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে, তাদের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহ থাকে না। তারা পরীক্ষায় পাস করার জন্য যে পন্থা গ্রহণ করে, তাকে 'সারফেস লার্নিং' বলে। এ ধরনের ছাত্রদের 'ডিপ লার্নিং' পন্থা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার দায়িত্ব শিক্ষককেই নিতে হয়। স্কুল পর্যায়ে নতুন চিন্তাধারার শিক্ষা ব্যবস্থা 'থিংকিং স্কুল, লার্নিং নেশন' প্রবর্তন করে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার আরও উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে– একটি সহনশীল, সৃষ্টিশীল চিন্তা ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষার অধিকারী এবং মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমিক যুবক শ্রেণি গঠন করা।

আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তিনটি উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছে– ১. উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী গ্র্যাজুয়েট তৈরি; ২. নতুন জ্ঞান ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা করা এবং ৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য যুগোপযোগী মানবসম্পদ তৈরি করা। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং ইউটিলিটারিয়ান বিষয়গুলোর ওপর জোর দিতে হবে। একটি সহনশীল, সৃষ্টিশীল চিন্তার অধিকারী, মূল্যবোধ ও দেশপ্রেমিক এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষিত যুবক শ্রেণি গঠনে শিক্ষকদের মুখ্য ভূমিকা নিতে হবে। শিক্ষকদের জানতে হবে, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলো, জানতে হবে টেকনোলজির ব্যবহার এবং ছাত্রদের সন্তুষ্টির বিষয়গুলোর ব্যাপারে অধিক যত্নবান হতে হবে।